HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০১ বাংলাদেশর মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার, জনগণ ও প্রচার মাধ্যম

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ও প্রক্রিয়া
টপিক ০২: ভারত সরকারের অবদান
টপিক ০৩: ভারতীয় জনগণের অবদান
টপিক ০৪: ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান
টপিক ০৫: মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা
টপিক ০৬: সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা
টপিক ০৭: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা
টপিক ০৮: চীনের ভূমিকা
টপিক ০৯: ব্রিটেনের ভূমিকা
টপিক ১০: মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ
টপিক ১১: মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা
টপিক ১২: মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার, জনগণ ও প্রচার মাধ্যম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার, জনগণ ও প্রচার মাধ্যম

ভারত বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশের তিনদিকেই ভারতের ভূখণ্ড। তাছাড়া বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলা, আসাম এবং ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে এই দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিভক্তি ঘটলেও, জনগণের মধ্যে শত শত বছরের আত্মিক সম্পর্কের ছেদ পড়েনি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার, জনগণ ও প্রচার মাধ্যম

বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণার পর বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে স্বীকৃতি ও সমর্থনের আবেদন জানায়। ১৯৭১ সালের ৩০ ও ৩১. মার্চ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি', সিপিআই'-এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক কমিটি' এবং সিপিএমের উদ্যোগে 'বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়েছিল। ৩০ মার্চ কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। ভারতের পত্র-পত্রিকাতেও নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হতো।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। তাছাড়া ভারত মুক্তিযুদ্ধে সামরিক সহায়তা এবং লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সর্বোপরি সামরিক সমর্থন দিয়ে সাহায্য করেছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার, জনগণ ও প্রচার মাধ্যম

ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থী, ১৯৭১

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০২ ভারত সরকারের অবদান

ভারত সরকারের অবদান

This Topic is important for

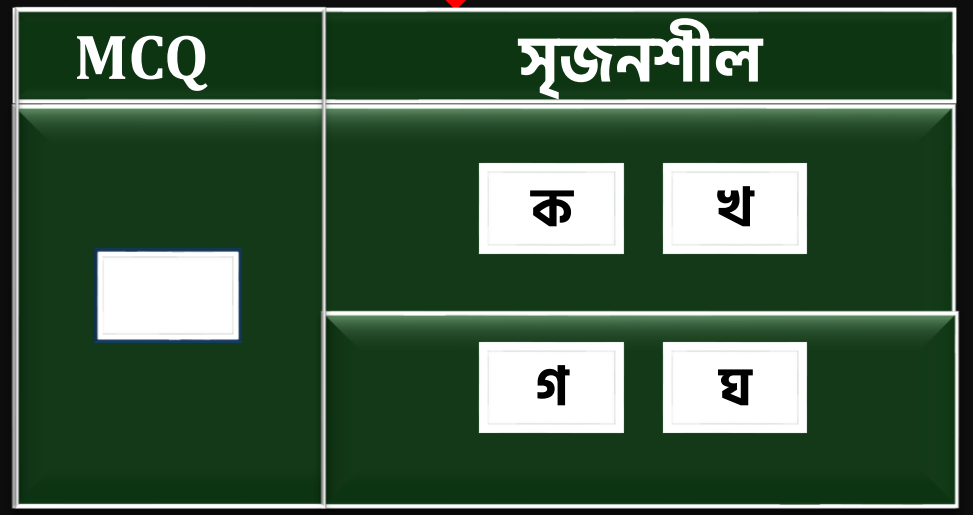

ভারত সরকারের অবদান

মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকার বাংলাদেশকে যে সহযোগিতা প্রদান করে তার মধ্যে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন প্রদান করে, শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান করে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ভারতের মাটিতে অবস্থান করে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রচ্ছন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকিস্তানিদের ঘাঁটিতে আক্রমণে অংশ নেয়, অস্ত্র ও ট্রেনিং প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে, ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয় ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথবাহিনী গঠন করে সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়। এ পর্যায়ে ভারত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। অবশেষে পাকিস্তানকে পরাজিত করে যৌথবাহিনী ঢাকা দখল করে। বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে তার সমুদয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়।

ভারত সরকারের অবদান

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লে হতবিহ্বল আতঙ্কিত মানুষ প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার্থে ভারতীয় সীমান্তের দিকে ধাবিত হয়। এই মানবিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ তার সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়। ভারতের স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন সীমান্তে সাদরে গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ভারত সরকার তার অবস্থান পরিষ্কার করে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ভারতের প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ: "বাঙালি নিধনযজ্ঞের মুখে বিশ্ববিবেক নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারে না।"

ভারত সরকারের অবদান

২৬ মার্চ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং তার সরকারের উদ্বেগের কথা জানান। ৩০ মার্চ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভার অধিবেশনে স্বয়ং দুই পৃষ্ঠার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের এই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানকে অভিনন্দন জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের মানুষ তাদের সংগ্রামে জয়যুক্ত হবে। তিনি ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে এই ন্যায়যুদ্ধে সর্বাত্মক সহানুভূতি ও সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন।

এই প্রস্তাবে তিনি বলেন, 'পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচনে জয়লাভের পরেই আমাদের বীর প্রতিবেশীদের যে মর্মান্তিক দুঃসময় এসেছে তা তাদের দুঃখ-দুর্দশার সাথে আমাদের একাত্ম করেছে। তাদের সুন্দর দেশের ওপর যে ধ্বংসলীলা চলছে, তাতে আমরা উদ্বিগ্ন।'

তিনি তার প্রস্তাবে আরও বলেন, 'শান্তি ও মানবিক অধিকারের প্রতি ভারতের যে আস্থা আছে তার কথা স্মরণ করে এই সভা' অবিলম্বে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর বল প্রয়োগ বন্ধের দাবি জানাচ্ছে।'

ভারত সরকারের অবদান

তাজউদ্দীন আহমদ ভারতীয় বিএসএফ প্রধান রুস্তমজি ও গোলক মজুমদারের সহায়তায় ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ৩ এপ্রিল সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতের পর ভারত সরকার নিম্নলিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে-

ক.ভারতের মাটিতে অবস্থান করে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে।

খ. সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়া হবে যাতে শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় নিতে পারে।

গ. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের একটি বেতার স্থাপন করা যাবে।

ভারত সরকারের অবদান

তাজউদ্দীন-ইন্দিরা সফল বৈঠকের পরই বাংলাদেশ সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। কোলকাতার থিয়েটার রোডে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের সচিবালয় স্থাপিত হয়। সেখানে ভারত সরকারের সহায়তায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রও স্থাপিত হয়। ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ট্রেনিং ক্যাম্প গড়ে ওঠে এবং সেখানে জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়া হয়। ভারত সরকার হালকা অস্ত্রও সরবরাহ করে। পাকিস্তানি বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পেতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক হিসেবে দেখা যায়, ২৫ মার্চের পর প্রতিদিন গড়ে ২০-৪৫ হাজার মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার। জুনের মধ্যে এ সংখ্যা ৫০ লক্ষে উন্নীত হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, ১৯৭১

ভারত সরকারের অবদান

জুন থেকে পাকিস্তানি নৃশংসতা এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রতিদিন গড়ে এক লক্ষ লোক সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। ফলে পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারীর সংখ্যা কোটিতে গিয়ে পৌছে। ভারত সরকারের নির্দেশে এর সীমান্তবর্তী অঞ্চলের প্রশাসন আশ্রয় শিবির নির্মাণ করে। তারা লঙ্গরখানা স্থাপন করে বুভুক্ষু মানুষদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই শরণার্থীদের ভরণপোষণের জন্য ভারতকে ব্যয় করতে হয়েছে তৎকালীন মুদ্রায় ২৬০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ভারত ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রের অবদান ছিল মাত্র ৫০ কোটি টাকা।

তাছাড়া প্রায় লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ, সামরিক সরঞ্জাম ও রসদ সরবরাহ বাবদ তৎকালীন মুদ্রায় ভারতের ব্যয় হয়েছিল প্রায় ৫০০ কোটি রূপি। তবে মোট ব্যয়ের হিসেব ধরা হয়েছিল ৫৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।' অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ভারতের সরকার ও জনগণের শরণার্থীদের প্রতি এ মানবীয় সহযোগিতা ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার নিঃসন্দেহে অনন্য। তাছাড়া শুধু আর্থিক খরচের হিসেব দিয়ে এই অবদানের ব্যাপকতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

ভারত সরকারের অবদান

১৯৭১ সালের মাঝামাঝি থেকে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রচ্ছন্নভাবে অংশ নেয়া শুরু করে এবং ভারতীয় বাহিনী সীমান্তবর্তী পাকিস্তানি অবস্থানগুলোতে হামলা শুরু করে। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার ভারত সফরকালে ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানালে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। জুলাই মাসে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সমঝোতা হলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা চালায়। ৯ আগস্ট রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ভারত আরও জোরালো ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ২৪ অক্টোবর ১৯৭১ মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বজনমতকে বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনার জন্য ১৯ দিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে বের হন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে সে প্রসঙ্গ টেনে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'We don't want to go to war. In fact, we tried to avoid it. ...but, what is peace? Peace does not mean that we keep quite while the people of a neighbouring country are being annihilated. This is not peace."" (আমরা যুদ্ধ চাই না। প্রকৃতপক্ষে আমরা যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছি... কিন্তু শান্তি কী? শান্তি বলতে এটা বোঝায় না যে আমাদের প্রতিবেশী দেশের মানুষকে গণহারে হত্যা করা হবে আর আমরা নিশ্চুপ থাকব। এটা শান্তি নয়।)

ভারত সরকারের অবদান

নভেম্বরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে পাকবাহিনী অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এসময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীও যথেষ্ট প্রশিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশের সেনা ও নৌ ইউনিটগুলো অনেকটা শক্তিশালী কাঠামো লাভ করে। এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তারা বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে শক্তি বৃদ্ধি করে। চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের এরূপ সক্রিয় অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করে। পূর্ব-পাকিস্তানের পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে কোণঠাসা অবস্থান থেকে এবং সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তারা জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাসের প্রচেষ্টা চালায়। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠিত হয়। ৩০ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় লোকসভায় ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি বাহিনী প্রত্যাহার করা না হলে সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে না।' এমতাবস্থায় ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে বিমান আক্রমণ শুরু করে। ৪ ডিসেম্বর ভারতও *পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে

ভারত সরকারের অবদান

বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী

ভারত সরকারের অবদান

ভারতে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ডি এম মার্শাল এন্ডি গ্রেচকো'র (D M'Marshal Andey Grechko) ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে প্রেরিত গোপন বার্তা থেকে জানা যায়, ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানি এয়ারফোর্স ভারত আক্রমণ করলে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ভারতীয় ডেস্ট্রয়ার 'রাজপুত' থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তানি সাবমেরিনকে ডুবিয়ে দেয়। ৪ ও ৯ ডিসেম্বর ভারতীয় স্পিডবোটগুলো সোভিয়েত নির্মিত এন্টিশিপ পি-১৫ মিসাইল আক্রমণ দ্বারা ১০টি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজকে ধ্বংস করে দেয়। তাছাড়া এ সময়ের মধ্যে ১২টি পাকিস্তানি তৈলগুদাম অগ্নিদগ্ধ করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে উপনীত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। ১৬ ডিসেম্বর বিকালে পাকিস্তানি বাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করলে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর প্রায় চার হাজার অফিসার ও জওয়ান আত্মত্যাগ করেন। :

ভারত সরকারের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জয়যুক্ত করতে গিয়ে ভারতের অসংখ্য বেসামরিক লোকজনও নিহত হয়। ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো যেমন আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বাংলার আর্থ-সামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর মারাত্মক চাপ পড়ে। মুজিবনগর সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনার সমন্বয়ে যে যৌথবাহিনী গঠিত হয়েছিল সেই যৌথবাহিনীর সিদ্ধান্তেই ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরেও বাংলাদেশে অবস্থান করছিল।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য এটি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময়ই ভারতে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতিকালেই তার অনুরোধে ইন্দিরা গান্ধী সরকার বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী জন্মদিবসের পূর্বেই ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। ভারত সরকার তার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চের আগেই শেষ ভারতীয় সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৩ ভারতীয় জনগণের অবদান

ভারতীয় জনগণের অবদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ভারতীয় জনগণের অবদান

'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য'- এই চিরন্তন বাক্যটির প্রতিফলন আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সীমাহীন ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সম্প্রদায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানায়। তাদের সমর্থন ও দাবির ফলেই ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় জনগণ শুধু সমর্থন দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করেনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তহবিল সংগ্রহ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় প্রভৃতি কাজগুলো তারা করেছে। এমনকি বাংলাদেশ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ভরণ-পোষণের জন্য ভারত সরকার তার জনগণের ওপর যে 'শরণার্থী কর' আরোপ করেছিল, তা সেদেশের জনগণ আন্তরিকতার সাথেই গ্রহণ করেছিল। এ ধরনের উদ্যোগ এবং তার প্রতি জনগণের অকুন্ঠ সমর্থনের ঘটনা বিশ্বে বিরল।

ভারতীয় জনগণের অবদান

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের বিরোধী দলগুলো বাংলাদেশ সংক্রান্ত ভারত সরকারের সকল সিদ্ধান্তে আন্তরিকতার সাথে সমর্থন দেয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একযোগে কাজ করে। বিশেষ করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), সোশ্যালিস্ট পার্টি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনসংঘ ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশকে সক্রিয় ও কার্যকর সমর্থন দানের দাবি জানায়, যাতে করে বাংলাদেশের মানুষ সংগ্রামে সফল হয়। বাংলাদেশ আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বাজেট অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয়, '...to do something concrete in support of the cause of Bangladesh in its humbly way

মানুষ প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার্থে ভারতীয় সীমান্তের দিকে যাচ্ছে, ১৯৭১

ভারতীয় জনগণের অবদান

এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এস এন সেনকে সভাপতি করে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' গঠন করা হয়। এই সমিতি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ছাড়াও শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করে। সারা বিশ্বকে পাকিস্তানি বর্বরতা সম্পর্কে জানানো ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানের যৌক্তিকতা তুলে ধরে এ সমিতি ইংরেজিতে ছয়টি ও বাংলায় পাঁচটি মনোগ্রাফ' প্রকাশ করে। ২০০০ মনোগ্রাফ সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ, রোটারিয়ানদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।”

তাছাড়া এই সমিতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থনের অনুরোধ নিয়ে আফগানিস্তান, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ভ্যাটিকান ও পশ্চিম জার্মানিতে ছয়টি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।

ভারতীয় জনগণের অবদান

২৪ এপ্রিল বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকগণ 'বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি' গড়ে তোলেন। এ কমিটির উদ্যোগে বিখ্যাত কবি আলী সর্দার জাফরী, কাইফী আজমী, কাওয়ালী শিল্পী ইউসুফ আজাদ, রশিদা খাতুন প্রমুখ ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশের পক্ষে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করেন। এ প্রসঙ্গে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল, '...সারা ভারতবর্ষ যেন বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। ভাবা যায় না। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে এদেশে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই সম্প্রীতির মনোভাব অন্য উপলক্ষে কখনও ঘটেনি।১২ এ রকম আরও অসংখ্য সমিতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠেছিল যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে।

ভারতীয় জনগণের অবদান

ভারতের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী পণ্ডিত রবি শঙ্কর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে Concert For Bangladesh আয়োজন করে দশ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেন এবং ইউনিসেফের মাধ্যমে শরণার্থী শিশুদের দান করে দেন। পণ্ডিত রবি শঙ্কর মূলত এই অনুষ্ঠানের জন্য জর্জ হ্যারিসনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মকবুল ফিদা হোসেনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছবি এঁকে ছিলেন এবং বোম্বের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তা বিক্রি করে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্য সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক শাহরিয়ার কবীর লিখেছেন যে, বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, শ্যামল দত্ত রায়, গণেশ পাইনের মতো খ্যাতিমান শিল্পীরা ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাসের পর মাস বাংলাদেশের ওপর ছবি একে তা বিক্রি করে সেই টাকা শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রণব রঞ্জন রায়, তরুণ স্যানাল, অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, নির্মল চক্রবর্তী, ফুলরেণু গুহ, ইলা মিত্র, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। শিল্পী বাঁধন দাশ ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে তার এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে শরণার্থী শিবিরে গিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র খোলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতীয় জনগণের অবদান

শাহরিয়ার কবীর তার লেখায় ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে আরও লিখেছেন, 'শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন, গাইয়েরা বাংলাদেশের ওপর বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন, নাট্যকর্মীরা নাটক করেছেন, ঋত্বিক ঘটক, শুকদেব আর গীতা মেহতারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ভেতর এমন ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাবে যারা কোনো না কোনোভাবে তখন বাংলাদেশকে সাহায্য করেনি। অগণিত শরণার্থী চেনা-অচেনা সাধারণ মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল যাদের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও হৃদয়ের বিশালতা ছিল অন্তহীন।'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৪ ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

This Topic is important for

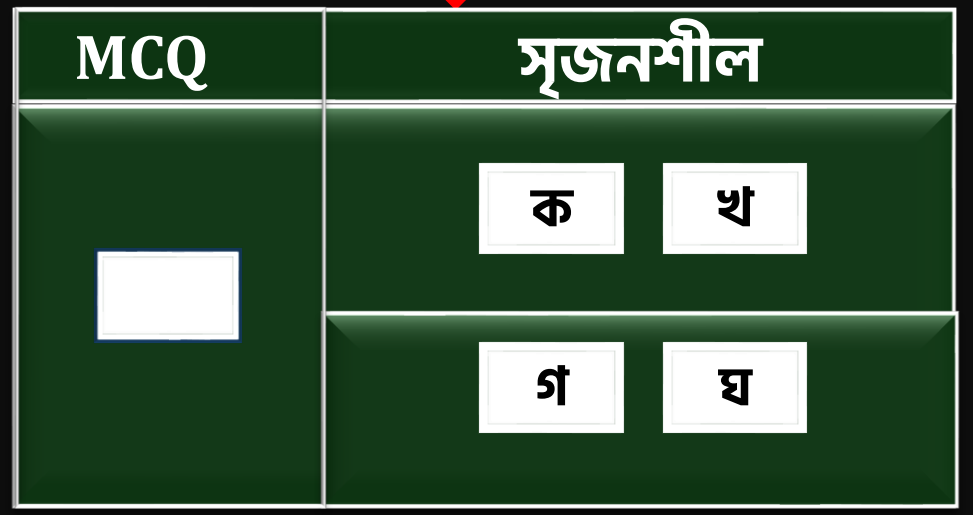

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমতকে সংগঠিত করা এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দৃঢ় রাখার জন্য ভারতের প্রচারমাধ্যম ব্যাপক অবদান রেখেছে। ভারতীয় প্রিন্টমিডিয়া ও সম্প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের অপপ্রচার বিশ্বের কাছে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতি বিশ্বজনমত ক্রমেই সহানুভূতিশীল হয়েছে। ভারতীয় মিডিয়ার শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ প্রচারণার ফলে বিশ্বের মানুষ বুঝতে পারে, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটে চলেছে, তাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

ভারতের যেসব পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য খবর ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রকাশ করেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'দ্য হিন্দুস্তান টাইমস', 'দ্য ফ্রন্টিয়ার', 'দ্য কম্পাস', 'দ্য হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড', 'কালান্তর', 'নিউজ এজ', 'দ্য স্টেটসম্যান', 'দর্পণ', 'দ্য প্যাট্রিয়ট', 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া', প্রভৃতি।

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

THE STATESMAN

JOI BANGLA

Unconditionally

Cease-Fire By India

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বহুলপ্রচারিত 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চের এক প্রতিবেদনে লিখেছিল: 'ঢাকা, খুলনা ও অন্যান্য এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের হাতে প্রায় এক লাখ লোক নিহত হয়েছে।' ৩০ মার্চ ১৯৭১ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল: 'বাংলাদেশের জন্য আমরা কী করতে পারি।' ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ তারিখে 'দ্য হিন্দুস্থান টাইমস' লিখেছে: মুক্তিবাহিনী রাজশাহীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে পুনর্দখল করেছে। ২৮ নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিরোনাম করেছে: 'মুজিবকে মুক্তি দিন, রাজনৈতিক সমাধানে আসুন।' ১০ ডিসেম্বর এই পত্রিকা শিরোনাম করে: 'মুক্তির সংগ্রাম, মুক্তির দ্বারপ্রান্তে।'

১৬ ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' একটি শিরোনাম ছিল এরকম: 'নিয়াজির আরজি: যুদ্ধবিরতি চাই; মানেকশ: না, আত্মসমর্পণ।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলো নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের ওপর সংবাদ প্রকাশ করেছে। বিদেশি মিডিয়ায় এ ধরনের খবর প্রকাশিত হওয়ায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়, বহির্বিশ্বে পাকিস্তানি হানাদারদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হয় এবং বাঙালি জনসাধারণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ১৯৭১

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সম্প্রচার মাধ্যমও সেদেশে অবস্থানরত দেশি-বিদেশি সংবাদ সংস্থাও অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধের পুরো নয় মাস ধরে ভারতীয় সম্প্রচার মাধ্যমের অন্যতম প্রধান শিরোনাম থাকতো বাংলাদেশসংক্রান্ত। পাকিস্তানি বাহিনীর ২৫ মার্চের গণহত্যা শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ মার্চ দুপুর থেকেই আকাশবাণী কলকাতা (রাষ্ট্রীয় বেতার কেন্দ্র) তাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ রেখে বাংলা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সামরিক অভিযানের খবর বারবার প্রচার করতে থাকে। পশ্চিমা আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দিল্লী অফিস যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করে তা বিশ্বময় প্রচার করে। ভারতের সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ যে শুধু নিজেরাই বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে তা-ই নয়, তারা বাংলাদেশের 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'কে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে।

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

৩০ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট কেন্দ্রে পাকিস্তানি বিমান গোলাবর্ষণ করলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উদ্যোক্তারা কালুরঘাট গুদাম থেকে এক কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন আরেকটি ট্র্যান্সমিটার ট্রাকে করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ত্রিপুরায় নিয়ে যান। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের সহায়তায় ৩ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত সম্প্রচার চালানো হয়।

THE STATESMAN

THE WAR IS OVER

Pindi Accepts India's Cease-Fire Offer

COMBATANTS TO HOLD ADVANCE POSITIONS

No Automatic Exchange Of P.O.W.s

ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের অবদান

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে আরেকটি ট্র্যান্সমিটারের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ডকৃত ভাষণ ১০ এপ্রিল সকালে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে'র নামে সম্প্রচারিত হয়। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারত সরকারের সহায়তায় মুজিবনগর সরকার কলকাতার থিয়েটার রোডে ৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সম্প্রচার কেন্দ্র চালু করতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের অনেক পত্রপত্রিকাও কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। এসব মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচারের ফলে পাকিস্তানিদের অপকীর্তির খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। বিশ্বের বৃহৎ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সমর্থন সত্ত্বেও পাকিস্তান যে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য হয়, তার পেছনে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের প্রচারমাধ্যমের এরকম সক্রিয় ভূমিকা কাজ করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৫ মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্ব দুইটি পরাশক্তি বলয়ে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার প্রভাবাধীন রাষ্ট্রসমূহ। অপরদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র রাষ্ট্রসমূহ। প্রথমোক্ত রাষ্ট্রসমূহ ছিল মূলত গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। দ্বিতীয়োক্তরা ছিল সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী।

তবে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এছাড়া অপর কতিপয় দেশ বৈশ্বিক ঘটনাবলির ওপর বেশ প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে বলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদেরও সমীহ করা হতো। এ রাষ্ট্রগুলো হলো ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে এ রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানি বর্বর গণহত্যাকে এর অভ্যন্তরীণ ঘটনা হিসেবেই দেখেছে। কিন্তু যতই সময় অতিক্রান্ত হয়, ততই বিশ্বের জাতিসমূহের সামনে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়; পাকিস্তানে যা ঘটে চলেছে তা মানবাধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা এবং বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হবে কিনা।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হলে তা জাতিসংঘের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাসংক্রান্ত আইনের লঙ্ঘন হবে কিনা। বাংলাদেশের অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাঁড়াশি আক্রমণের মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিপর্যয় সৃষ্টির ফলেই বৃহৎ শক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হয় যে এটি আসলে একটি 'জনযুদ্ধ', এটিকে নিছক পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যায় না। তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বৃহৎ শক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেছে, একটি পক্ষ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুসারী রাষ্ট্রসমূহ) পাকিস্তানি গণহত্যাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে সাফাই গেয়েছে। অপরপক্ষ (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ) মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানি বর্বরতার বিপরীতে ন্যায়যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৬ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে। এর প্রমাণ আমরা পাই যখন দেখি, ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এতে নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে। অবশ্য একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে একই আদর্শে পরিচালিত চীনের বিরোধিতা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে উভয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনের ওপর জোর দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালের ৩ জানুয়ারি তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে মিলিত হয়ে জাতিসংঘের আইন মোতাবেক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সম্মত হন এবং ২৫ ফেব্রুয়ারির আগেই উভয় রাষ্ট্র তাদের সৈন্যদের যুদ্ধপূর্ব অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরুতে পাকিস্তানের পরিকাঠামোর মধ্যে বাঙালির শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আসছিল। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের ভাষণে ব্রেজনেভ'পূর্ববাংলার' জনগণের ন্যায়সংগত অধিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছার জন্য পাকিস্তান সরকারকে আহ্বান জানান। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি ইয়াহিয়া খানকে একটি পত্র লেখেন। এ চিঠির ভাষা কূটনৈতিক দিক দিয়ে ছিল খুবই কড়া।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

তিনি লিখেছিলেন, "পাকিস্তানের জনগণের কঠিন পরীক্ষার দিনে খাঁটি বন্ধু হিসেবে আমরা দু-একটি কথা না বলে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমানে পাকিস্তানে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বল প্রয়োগ না করে রাজনৈতিকভাবে তার সমাধান করা যায় এবং তা করতে হবে। “ সোভিয়েত ইউনিয়ন শুরুতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। জুলাই মাসের ৯-১০ তারিখে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান ও চীন সফর করলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে এর গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হয়। ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উভয় দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মত বিনিময় বৃদ্ধি পায়।

নিকোলাই পদগোর্নি

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

এরপর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে তার অবস্থান পরিবর্তন করে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে শক্ত অবস্থান নিতে শুরু করে। ১৯৭১ সালের ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে তিনজন সোভিয়েত শীর্ষনেতা- লিওনিদ ব্রেজনেভ, নিকোলাই পদগোর্নি এবং আলেক্সি কোসিগিন দীর্ঘক্ষণ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন।

এসময় ব্রেজনেভ বুঝতে পারেন যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রমাণ রয়েছে। 'Brežnev observes that there is an element of national liberation present in the situation." (ব্রেজনেভ লক্ষ করেন যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উপাদান বিদ্যমান)

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গঙ্গটি প্রাধান্য পায়। এসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রগণ পাকিস্তানের আসন্ন পরাজয় রোধকল্পে মরিয়া হয়ে একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাসের চেষ্টা চালায়। কিন্তু সোভিয়েত বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি। ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর জন্য পাকিস্তানকে সরাসরি দায়ী করে এবং জাতীয় স্বার্থে নিষ্ক্রিয় থাকবেনা বলে হুমকি প্রদান করে। ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনীর বিজয় সম্ভাবনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) তৃতীয় বারের মতো 'ভেটো' প্রদান করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় বরণ করলে ২১ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে।

পরাশক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা পাকিস্তানি ধ্বংসলীলা ও গণহত্যার ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে বিশ্বজনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৭ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। স্নায়ুযুদ্ধের প্রভাবই এর একমাত্র কারণ। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল খুবই সামান্য। এসময় দক্ষিণ এশিয়াসংক্রান্ত বিষয়ে আমেরিকার মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ব্রিটিশ চিন্তার প্রতিফলন। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- পরবর্তী সময়েও দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের ওপরই নির্ভর করত।

১৯৪৯ সালের পর দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়। এসময় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ ছিল ভারতকে নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের আশঙ্কা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে ভারতে চীনের মতো সমাজতন্ত্র সম্প্রসারিত হতে পারে। এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান (Harry S. Truman) এবং আইজেনহাওয়ার (Dwight D. Eisenhower) মার্শাল পরিকল্পনার আলোকে ভারতে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২টি C-130 হারকিউলিস ট্রান্সপোর্ট ভারতে ক্রুসহ প্রেরণ করে, যাতে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণকে ভারত সাহায্য করতে পারে। এতে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে তার নিরাপত্তার অন্বেষণে চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে আইয়ুব খান চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। চীনের সাথে পাকিস্তানের সখ্যের কারণে শঙ্কিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের ওপর থেকে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় এবং ভারত-পাকিস্তান উভয়ের কাছে Non-lethal weapon বিক্রয় করতে সম্মত হয়। এদিকে চীন সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলেও সোভিয়েত কর্তৃত্বকে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আবার, চীন ও পাকিস্তান উভয়েই ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় আইয়ুব খানের প্রচেষ্টায় পাক-মার্কিন-চীন সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে এ সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। ফলে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা সত্ত্বেও চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার ওপর জোর দেয়। তবে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন নীতি দু'ভাবে প্রকাশিত হয়। মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করলেও মার্কিন জনগণ এবং মার্কিন কংগ্রেস ও সিনেটের কতিপয় প্রভাবশালী সদস্য বাংলাদেশের প্রতি শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে শুধুই পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ (George H. W. Bush) (যিনি পরবর্তীতে ৪১তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন) একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ২৬ তম ' (বিশেষ) অধিবেশনে জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ আলোচনায় অংশ নিয়ে সমস্যার জন্য ভারতকে এককভাবে দায়ী করেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন সময় ভারত কর্তৃক জাতিসংঘের বিভিন্ন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

১৯৭১ সালের আগস্টে 'ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি'কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মনে করে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতার জন্য এটি একটি Blank Cheque. এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একদিকে জাতিসংঘের মাধ্যমে ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই মর্মে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলাতে চাপ প্রদান না করলে দাঁতাত (Detenete) আলোচনা ভেঙে যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিক্সন (Richard Nixon)। তার সময় দক্ষিণ এশিয়ায় এতদিনকার মার্কিন নীতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এর কারণ হিসেবে দুটি বিষয়কে উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, নিক্সনের ওপর তার নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারি ড. হেনরি কিসিঞ্জারের প্রবল প্রভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় রাজনীতির তিক্ততা। হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন প্রবল ভারতবিরোধী। ষাটের দশকে তিনি যখন দক্ষিণ এশিয়া সফর করেন তখন ভারত তাকে যে আতিথেয়তা প্রদান করে তা তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। অপরদিকে তিনি যখন পাকিস্তান সফর করেন তখন পাকিস্তানি জেনারেলগণ তাকে রাজকীয় আতিথেয়তা প্রদান করে, যা. তাকে মুগ্ধ করেছিল। এজন্য তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তান ও চীনকে বেছে নিতে প্রভাবিত করেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডেমোক্রেট দলীয় প্রার্থী কেনেডিকে পরাজিত করে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ধারণা করা হয়, মার্কিন L নির্বাচনের সময় ভারতের প্ররোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় ভোটারগণ কেনেডিকে সমর্থন করেছিলেন। এজন্য নিক্সন ভারতের ওপর রুষ্ট ছিলেন। ২০১২ সালের ২৯ নভেম্বর তারিখে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রকাশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত দলিলে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার নিরাপত্তাবিষয়ক সহকারী ড. হেনরি কিসিঞ্জারকে নির্দেশ দেন, জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়াকে তিনি যেন এইমর্মে সম্মত করান যাতে তিনি চীন-মার্কিন মিলিত সহায়তা পাকিস্তানে প্রদান করতে সম্মত হন।

পাকিস্তানের পুরনো মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনী হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দেওয়া অব্যহত রেখেছিল। তবে মার্কিন জনগণ, প্রচারমাধ্যম এবং রাজনীতিকদের অনেকে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কয়েকজন প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য পাকিস্তানের বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। তিনি ভারতের শরণার্থী শিবিরে বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভোগ দেখে আবেগে আপ্লুত হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রকাশিত দলিল অনুসারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর।২০ এসময় যুক্তরাষ্ট্র জর্ডান ও ইরান হয়ে পাকিস্তানে সামরিক সরবরাহ পাঠায় এবং রণতরি ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায়। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ১১ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়।

অপরদিকে, ৬ ডিসেম্বর সোভিয়েত নৌবাহিনীও ভারত মহাসাগরে কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলো 'ভ্লাডিভোস্টক' থেকে উপমহাদেশের দিকে রওনা দিয়েছিল। রাশিয়ার এ যুদ্ধজাহাজগুলো ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে 'ইউএস টাস্ক ফোর্স-৭৪'-কে অনুসরণ করে। এর ফলে একটি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক হুমকি মোকাবিলা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি পারমাণবিক সাবমেরিনও ভারত মহাসাগরে পাঠিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র রিপোর্ট ছিল যে, পাকিস্তানের মিত্র চীন উত্তর দিক থেকে ভারত আক্রমণ করবে না। যদি চীন উত্তর দিক থেকে ভারত আক্রমণ করত তাহলে ভারত উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম- এই তিন দিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে পর্যুদস্ত হয়ে যেত। বাংলাদেশের পক্ষ নেওয়া ভারতকে চাপে রাখার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ দিক থেকে ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে পাঠায়। রাশিয়ার কর্মকর্তা ভ্লাদিমির ক্রুগলিয়াকভ এ ব্যাপারে বলেন, "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের রণতরিগুলোকে ভারত মহাসাগরে এমনভাবে ঘিরে ধরি যেন তারা ঢাকা, করাচি কিংবা চট্টগ্রাম পৌছাতে না পারে। আমরা ঝুঁকি নিয়ে তাদের যতটা সম্ভব কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

যাই হোক, এর মধ্যে ব্রিটিশ বিমানবাহী রণতরী বঙ্গোপসাগরে ঢুকতে গিয়ে সোভিয়েত বাধার মুখে অন্যত্র চলে যায়। এরপর মার্কিন ৭ম নৌবহরও আর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসেনি। অনেক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক এখন মনে করেন, বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম নৌবহর পাঠানো ছিল একটি 'কাগুজে বাঘ'। তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায়নি বলেই ৭ম নৌবহরকে পাঠাতে বিলম্ব করে এবং শেষপর্যন্ত ফিরিয়েও নেয়। ততক্ষণে বাংলাদেশ-ভারত যৌথবাহিনী স্থলপথে অগ্রসর হয়ে ঢাকা দখল করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে গেলে যুক্তরাষ্ট্র ৪ এবং ১২ ডিসেম্বরে জাতিসংঘে দু'বার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোর কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, আসন্ন নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই মার্কিন পরামর্শে পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছিল। এতে জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে বাঙালিদের হাতে পরাজয়ের লজ্জা থেকে রেহাই পাওয়া যেতো।

মার্কিন সরকারের অবস্থান যাই থাক, দেশটির সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিকদের অনেকেই বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান দলীয় হলেও কংগ্রেসে প্রাধান্য ছিল ডেমোক্রেট দলের। ডেমোক্রেটরা ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল দুজন ডেমোক্রেট দলীয় সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং ফ্রেড হ্যারিস বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ এবং বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্যের দাবি জানান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

১৪ এপ্রিল প্রভাবশালী 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ২৯ জন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবেদন ছাপা হয়। এ লেখায় মার্কিন পণ্ডিতরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পদত্যাগ দাবি করেন। ১৫ এপ্রিল রিপাবলিকান দলীয় সিনেটর ক্লিফোর্ড কেইস এবং ডেমোক্রেট দলীয় সদস্য ওয়াল্টার মন্ডেইল যৌথভাবে কংগ্রেসে পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য দেওয়া স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন। এটি ৬ মে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। এর ফলে পাকিস্তানকে যে ৫৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল তার মধ্যে মাত্র ৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য দেয়া হয়, বাকিটা আর দেয়া হয়নি। অপরদিকে মার্কিন সরকার বাঙালি শরণার্থীদের জন্য ৩০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সরকার সেখানে আটক বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু করলে মার্কিন কংগ্রেসের ৫৫ জন সদস্য ' প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে চিঠি লিখে এ প্রহসনের বিচার বন্ধ করার এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার আবেদন জানান। আগস্টের শুরুতে ১১ জন সিনেটর বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার্থে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিকর্মীরাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। ১ আগস্ট নিউইয়র্কে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে বাংলাদেশকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে একটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের বিশ্বখ্যাত সেতারবাদক রবিশঙ্কর তার পশ্চিমী শিল্পী বন্ধুদের সঙ্গে মিলে এর আয়োজন করেন। ওই কনসার্টে দুই পর্বে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত হয়েছিল। এ কনসার্টে অংশ নেন পণ্ডিত রবি শঙ্কর, জর্জ হ্যারিসন, রিঙ্গো স্টার, বব ডিলান, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রেস্টন, আলী আকবর খান প্রমুখ। এ কনসার্টের মাধ্যমে শরণার্থীদের জন্য শুধু যে বিপুল সাহায্য আসে শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তানের চালানো নির্মমতার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

অনেক মার্কিন নাগরিক পাকিস্তানের প্রতি এজন্য তীব্র ক্ষোভ এবং ঘৃণা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। 'টাইম ম্যাগাজিন' যে শিরোনাম করেছিল, তার অনুবাদ এরকম- 'পাকিস্তান: তীব্র যন্ত্রণা: সোনার বাংলার বলাৎকার'। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর শিরোনাম ছিল-'বাংলা: একটি জাতির হত্যা'।

তাহলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তখনকার মার্কিন সরকার ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বিশ্বাসী। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি প্রদান করে ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৮ চীনের ভূমিকা

চীনের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

চীনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি চীনের মনোভাব ছিল খুবই হতাশাজনক। চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়ার পূর্বসূরি) সাথে আদর্শিক দ্বন্দ্ব তাকে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুতে পরিণত করে। ভারত চীনের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তান প্রথম থেকেই পরস্পরের সঙ্গে বৈরিতায় লিপ্ত। এ কারণে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে তৈরি হয়েছিল গভীর বন্ধুত্ব। ফলে চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনের ভূমিকাকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়টি এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত। এসময় চীন যথাসম্ভব নীরব ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। ২৫ মার্চের গণহত্যার পর সারা বিশ্ব যখন পাকিস্তানি শাসকদের বর্বরতার বিরুদ্ধে চীনের সরকারি পর্যায়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চীন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত ঘটনাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও চীন পাকিস্তান সমস্যা সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকে কৌশলী অবস্থান নেয়। তবে জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার চীন সফর করার পর চীন ক্রমে সক্রিয় হতে শুরু করে। আগস্ট মাসে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ক্ষুব্ধ চীন মার্কিন বলয়ে যোগ দেয়। তারা পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেওয়া অব্যাহত রাখে। তবে পাকিস্তান বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও চীন দেশটির সাথে কোনো সামরিক চুক্তি করা থেকে বিরত থাকে।

চীনের ভূমিকা

১৯৭১ সালের মধ্যভাগে চীন পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১০০টি ট্রাকভর্তি সমর উপকরণ পাঠাত। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞে বহু চীনা অস্ত্রসরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পাকিস্তানি সেনাদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে অক্টোবর মাসে চীন ঢাকায় ২০০ বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল।২০ ২৯ নভেম্বর চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন নিয়েন পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত উত্তেজনার জন্য রাশিয়া ও ভারতকে দায়ী করেন। জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা চিয়ান কুয়ান দুয়াও দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিকে দায়ী করেন। ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আগ পর্যন্ত চীনের এ নীতি দেখা যায়।

মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছলে চীন খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। এসময় দেশটি সরাসরি বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান নেয়। ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বক্তব্য দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে আবেদন জানান। তাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক হলে চীন তার বিরোধিতা করে। চীনা প্রতিনিধি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কটাক্ষও করেন।

চীনের ভূমিকা

তিনি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে 'পূর্ব-পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি' আখ্যায়িত করেন। ৫ ও ৭ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানসংক্রান্ত দুটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে চীন তা ভেটো দিয়ে আটকে দেয়। জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী' এবং ভারতের মদদদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২৪ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করলে ওই দিন চীন সরকার এক বিবৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে 'রুশ-ভারতের সৃষ্টি' বলে মন্তব্য করে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি চীনের এরূপ নীতির মূল কারণ পাকিস্তানের সাথে দেশটির বন্ধুত্ব এবং ভারতের সাথে শত্রুতা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ০৯ ব্রিটেনের ভূমিকা

ব্রিটেনের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ব্রিটেনের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ব্রিটেন নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করে, কেননা বিবদমান তিনটি দেশই (ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ) মাত্র দুই দশক আগে তার ঔপনিবেশিক ছিল। অনেক তিক্ততা নিয়ে উপমহাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মোটের ওপর নিষ্ক্রিয় অবস্থানে থাকলেও দেশটি যুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে (১০ ডিসেম্বর) মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ভারত মহাসাগরে বিমানবাহী রণতরি 'ঈগল' পাঠায়। এই রণতরি পাঠানোর উদ্দেশ্য যতটা না পাকিস্তানকে সাহায্য করা তার চেয়ে বেশি ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়নের একচ্ছত্র উপস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের (রাশিয়া) সমরনায়ক ভ্লাদিমির কুগলিয়াকভের নেতৃত্বে একদল সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নেয়। তবে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজগুলো ব্রিটিশ রণতরি 'ঈগল'কে মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। এজন্য ভ্লাদিভোস্টক থেকে দ্রুত কুজার, ডেস্ট্রয়ার ও পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন পাঠানো হয়। বড় ধরনের সংঘাত এড়াতে ব্রিটিশ রণতরি 'ঈগল' শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগর এলাকায় প্রবেশ না করে দক্ষিণে মাদাগাস্কারের দিকে চলে যায়।

ব্রিটেনের ভূমিকা

ব্রিটেন মুক্তিযুদ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখলেও পাকিস্তান কাঠামোর মধ্য থেকেই বাঙালিদের স্বাধিকার সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দেয়। তবে ব্রিটেনের এরকম নিরপেক্ষ অবস্থানের কারণেই দেশটির মাটিতে অবস্থান করে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার কাজটি স্বচ্ছন্দ্যে করতে পারে।

ব্রিটিশ সরকার নিরপেক্ষ থাকলেও দেশটির পার্লামেন্টে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, হয়। ব্রিটেনের বিরোধী দল লেবার পার্টি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্স সভায় জন শোর এমপি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, ব্রিটিশ সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে চলমান গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুসারীদের নির্যাতন বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করবে কিনা। ৩১ মার্চ কমন্স সভার বিতর্কে লেবার পার্টির অনেক সদস্য পাকিস্তানের ওপর যুক্তরাজ্যের অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের দাবি জানান। এছাড়া তারা পাকিস্তানে সব ধরনের ব্রিটিশ সাহায্য বন্ধ রাখারও দাবি জানান। ১৭ জুন লেবার পার্টির ১২০ জন এমপি বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানান। ১১ অক্টোবর লেবার পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্রিটিশ নাগরিক বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশের সহায়তায় আয়োজিত কনসার্টে সংগীত পরিবেশন করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

ব্রিটেনের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা ও বেতার অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বিবিসির মাধ্যমেই সারা বিশ্ব ঢাকায় পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার তথ্য জানতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের বক্তৃতা-বিবৃতি, পত্রপত্রিকার সংবাদ-ফিচার, ব্রিটিশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের পরিবেশনা, বিবিসির নিরন্তর খবর ও সংবাদভাষ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করে। তবে বরাবর ব্রিটিশ সরকার মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকেই অনুসরণ করে। তারা সরকারিভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেয়নি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ১০ মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ

মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ

অনেক বিদেশি সংবাদপত্র, বেতার ও টিভিতে পাকিস্তানের ২৫ মার্চের গণহত্যার খবর প্রকাশিত হলে বিশ্বের প্রায় সব দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। তবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে প্রায় প্রতিটি দেশের নীতির মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আরব দেশগুলো সমর্থন দেয়নি। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'হিন্দুপ্রধান ভারতের' ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছিল। আরব দেশগুলো মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের কথা চিন্তা করে যেকোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে অবস্থান নেয়। এ সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানি নাগরিক কর্মরত ছিল। তারা পাকিস্তানের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় যে, বাংলাদেশের মুসলমানরা নিম্নশ্রেণির হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছে। সুতরাং এরা প্রকৃত মুসলিম নয় এবং এদের হিন্দুপ্রীতি বেশি। আর তাই তারা ভারতের প্ররোচনায় পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ

পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক আইয়ুব খান তার 'Friends Not Masters' (1967) গ্রন্থে বাঙালি মুসলিমকে নিম্নশ্রেণির মুসলিম হিসেবে তুলে ধরেছেন। এমনকি ভারতের মুসলমানরাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে নিরব ভূমিকা পালন করে। এসব কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো পাকিস্তানকেই সমর্থন করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সৌদি আরব ৭৫টি যুদ্ধবিমান এবং ইরান ট্যাঙ্ক, লরি, মোটরগাড়ি, হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান পাঠিয়ে পাকিস্তানকে সরাসরি সহায়তা করেছিল। আরব দেশগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন না দেওয়ার অন্যতম কারণ ১৯৭১ সালে ইসরাইলি পার্লামেন্ট 'নেসেট' (Knesset) বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পাশবিক অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাব পাস করে। তাছাড়া ইসরাইলি রেডক্রস মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য বিপুল পরিমাণ ওষুধ, কাপড় খাদ্য প্রেরণ করে। অবশ্য প্রবাসী মুজিবনগর সরকার ইসরাইলি সাহায্যের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ

তবে আরব দেশগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল ইরাক এবং মিসর। মিসর পাকিস্তানের সমালোচনা করে বলে, পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করা হয়নি। ইরাক মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে ২২ সদস্যবিশিষ্ট ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেদ্দা অধিবেশনে 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের ভূমিকাকে ন্যায়সঙ্গত বলে সমর্থন জানানো হয়। তবে জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানকে সমর্থন করেনি। সেসময় ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক শাসন চলছিল। ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল অসংখ্য ইন্দোনেশীয় ছাত্র সামরিক বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে মিছিল করে। ইন্দোনেশিয়ার টেলিভিশন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি খন্দকার মোশতাক আহমেদের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য দেশ

ফ্রান্স ও ইতালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জোরালো সমর্থন দিয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ইতালি বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। এছাড়া স্পেন, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পোল্যান্ড, কিউবা প্রভৃতি রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন জানায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার এবং নেপাল পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে অস্ত্র ও রসদবাহী জাহাজ বাংলাদেশের অভিমুখে রওনা হতো সেগুলো শ্রীলঙ্কায় যাত্রাবিরতি করে জ্বালানি সংগ্রহ করত। পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলোও শ্রীলঙ্কার বিমানবন্দর ব্যবহার করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ১১ মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল হতাশাজনক। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরই ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর গণহত্যা নিবৃত্তি ও শাস্তিবিষয়ক সনদ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে যে ঘৃণ্য গণহত্যা সংঘটিত করে তার জন্য জাতিসংঘ পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকি সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ তো দূরে থাকুক, বাংলাদেশ-সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই করতে পারেনি। এসময় জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন বার্মার (বর্তমান, মিয়ানমার) সাবেক কূটনীতিক উ থান্ট (U Thant)। প্রসঙ্গত, বার্মা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি। এমনকি ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধে মানবিক ব্যবহারের যে নিশ্চয়তা বিধান করা হয়, সেই দায়িত্ব জাতিসংঘ পালন করতে পারেনি। এর একটি কারণ হলো, জাতিসংঘ বড় শক্তিগুলোর রাবার স্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করেছে। আর জাতিসংঘে বড় শক্তিগুলোর সমঝোতা ছাড়া কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রশ্নে জাতিসংঘ (UN and the Recognition of Bangladesh) আর্ন্তজাতিক আইনে কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতির বিষয়টি একটি ব্যাপক ধারণা, কেননা এর সাথে শুধু আইনগত বিষয় নয়; বরং রাজনৈতিক বিষয়ও জড়িত। আন্তর্জাতিক সমাজে যখন কোনো একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে তখনই এর স্বীকৃতির প্রশ্নটি সামনে আসে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজন্য মুজিবনগর সরকার এর ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তৎপর হয়।

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৭এপ্রিল, ১৯৭১ শপথ গ্রহণের পরপরই বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, "Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpse... We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood."২৫ পাকিস্তান এখন মৃত। এটি এখন মৃতদেহের পাহাড়প্রমাণ স্তূপের নিচে চাপা পড়েছে। আমরা তাই আমাদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উপকরণগত ও নৈতিক উভয় ধরনের সহায়তার জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই।"

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

বাংলাদেশের এই স্বীকৃতির দাবি অযৌক্তিক ছিল না। কেননা একটি নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য যেসব শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তার সবগুলোই বাংলাদেশ পূরণ করেছিল। আন্তর্জাতিক আইনবিদ লটারপ্যাক্ট (Lauterpacht) যে চারটি শর্তের কথা বলেছেন তার সবগুলোই বাংলাদেশ পূরণ করেছিল। যেমন-

ক) নতুন রাষ্ট্রটির প্রতি ঐ রাষ্ট্রের জনগণের স্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শন;

খ) সরকারের স্থায়িত্ব;

গ) সরকারের কার্যকারিতা;

ঘ) সরকারের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে যে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রটির যাত্রা শুরু তার প্রতি নগন্যসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া প্রায় প্রতিটি বাঙালির অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। বাংলাদেশের প্রথম সরকার মুজিবনগর সরকারের প্রতিও আপামর বাঙালির ছিল নিরঙ্কুশ সমর্থন। এই সরকারের স্থায়িত্ব নিয়েও কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না। কেননা, এতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ছিলেন। এই সরকার কার্যকরভাবে একটি জনযুদ্ধ পরিচালনা করছিল। তারা সব আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি দিয়েছিল তা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল। মুজিবনগর সরকার তার পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছিল, 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।'

সুতরাং বাংলাদেশ জাতিসংঘের কাছে তার স্বীকৃতির জন্য যে বারবার আবেদন করেছিল তার যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের সমর্থক কয়েকটি ইউরোপীয় ও এশীয় রাষ্ট্রের বিরোধিতায় বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের আগে সরকারিভাবে কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। তবে বাংলাদেশের স্বীকৃতির পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসেই বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদ অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। এটিও এক ধরনের স্বীকৃতি।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

১৯৭১ সালের ১৬ জুন ব্রিটেনের শ্রমিকদলের ১২০ জন এমপি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। ৩ ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯টি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের উদ্যোগ নিলে ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। এ বৈঠকে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দেওয়ার অনুমতি চেয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্টের কাছে একটি পত্র দেন।

পত্রটি নিরাপত্তা পরিষদে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে নথিভুক্ত হয়। সভা শুরু হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি প্রস্তাব করেন যে, বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য শোনা উচিত। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে 'পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি' হিসেবে আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করেন। এ সংক্রান্ত একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হলে অবশেষে সভার সভাপতি একটি বুলিং প্রদান করেন, যাতে বাংলাদেশের প্রতিনিধির পত্র পাঠ করার অনুমতি দেওয়া হলেও বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধিকে অধিবেশনে অংশ নেওয়া কিংবা বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে জাতিসংঘ কার্যকর কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। বাংলাদেশের জনগণকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমেই তার স্বীকৃতি আদায় করে নিতে হয়েছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সামনে যে সমস্যাটি ছিল তা হলো, এর সনদের ২/৭ ধারা। এই ধারায় কোনো রাষ্ট্রের জনগণের মানবাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতির মধ্যে সীমারেখা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়েই যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রশ্নে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিরোধিতা করে।

অপরপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, পোল্যান্ড এসব রাষ্ট্র পাকিস্তানি বর্বরতা ও গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেয়। কিন্তু জাতিসংঘ 'রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার যুক্তির প্রশ্নে' বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা: বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যা বিষয়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলেও জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশে) এবং ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে জাতিসংঘ যে মানবিক কার্যক্রম চালায় তা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদন করার ফলে সাধারণ মানুষের কোনো কাজে আসেনি।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জাতিসংঘের যানবাহনগুলো তাদের নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছে। ত্রাণসামগ্রীও সেনা সদস্যরা কিংবা রাজাকার বা শান্তি কমিটির সদস্যরা আত্মসাৎ করেছে। এমনকি জাতিসংঘের দেওয়া ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পাকিস্তানের সহযোগীরা ব্যবসা করেছে বলেও ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। আর শরণার্থী শিবিরের জন্য জাতিসংঘ যে অর্থসাহায্য দিয়েছিল তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই অপ্রতুল।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশে অবস্থানরত বাঙালি এবং বিদেশি নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি জনতা বাংলাদেশের এই ন্যায়সংগত সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন এবং পাকিস্তানি বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য তারা নিজ দেশের সরকারের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছেন। এমনকি তারা আমাদের আর্থিক সহযোগিতাও করেছেন।

একাত্তরে কলকাতার উপশহর সল্টলেক সিটির শরণার্থী শিবিরে প্রায় আড়াই লাখের বেশি বাঙালি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই রোগে-শোকে, অনাহারে-অপুষ্টিতে, আমাশয়-ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিল। তাছাড়া সীমান্তবর্তী শিবিরগুলোতেও ছিল হাজার হাজার শরণার্থী। সেখানে জীবন বাঁচানোই ছিল এক মস্ত চ্যালেঞ্জ। কিন্তু বিশ্ব মানবতা নিশ্চুপ বসে থাকেনি।

মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গ

মাদার তেরেসা তার মিশনারিজ অব চ্যারেটির সদস্যদের নিয়ে এই সব মানুষের সেবা করেছেন। তিনি এই অসহায় মানুষদের চরম দুর্দশা খুব কাছে থেকে দেখে পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ওস্তাদ রবি শঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসন কনসার্ট করে শরণার্থীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি (পরে প্রেসিডেন্ট) কংগ্রেসে বাঙালিদের সাহায্য করার জন্য মার্কিন সিনেটে তীব্র বাকযুদ্ধ করেছেন। তিনি শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করে মার্কিন ত্রাণ বিতরণ করেছেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বহির্বিশ্ব

টপিক – ১২ মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে বিদেশি ব্যক্তিরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রেরণা যোগানোর জন্য তাদের এ অবদানের স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার বিদেশি বন্ধুদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা জানায়।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পক্ষে অসামান্য অবদানের জন্য সম্মাননা জানানোর প্রক্রিয়াকে তিন ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো- 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা', 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' ও 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা'। প্রথমটি দেওয়া হয়েছে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ইন্দিরার পক্ষে তার পুত্রবধূ ও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধী প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের কাছ থেকে এ সম্মাননা নেন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

ক্রমিক নং	তারিখ	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা	বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা	মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা		মোট
				ব্যক্তি	সংগঠন	
১ম	২৫-০৭-২০১১	০১ (শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী)	০০	০০	০০	০১
২য়	২৭-০৩-২০১২	০০	০৮	৭০	০৬	৮৪
৩য়	২০-১০-২০১২	০০	০২	৫৯	০০	৬১
৪র্থ	১৫-১২-২০১২	০০	০০	৬০	০২	৬২
৫ম	০৪-০৩-২০১৩	০০	০১ (মান্যবর রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী)	০০	০০	০১
৬ষ্ঠ	২৪-০৩-২০১৩	০০	০২	৬৬	০১	৬৯
৭ম	০১-১০-২০১৩	০০	০২	৫৭	০১	৬০
সর্বমোট =		০১	১৫	৩১২	১০	৩৩৮

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

আর 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' ও 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' যেসব দেশের ব্যক্তি ও সংগঠন পেয়েছে (মোট ৩৩৮টি) সেসব দেশ হচ্ছে- ভারত, নেপাল, ভুটান, রাশিয়া, সাবেক যুগোস্লাভিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মান, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালি, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, তুরস্ক ও মিশর। তালিকার মধ্যে রয়েছেন-ভারতের রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী, লে, জেনারেল (অব.) জ্যাক ফ্রেডরিক র‍্যাম্ফ জ্যাকব, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দশরথ দেব বর্মণ, ডি পি ধর, পি এন হাকসার, ভূপেন হাজারিকা, ওস্তাদ আলী আকবর খান, ফিল্ড মার্শাল এস এ এম মানেকশ, বিচারপতি সৈয়দ সাদাত আবুল মাসুদ, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, অন্নদা শঙ্কর রায়, অংশুমান রায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ড. করণ সিং, সরদার শরণ সিং, মেজর জেনারেল এস এস উবান, শ্রী গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অধ্যাপক নিহার রঞ্জন রায়, বেগম নার্গিস জাহাঙ্গীর রাবাদ (শাম্মী), মান্না দে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক, শ্রীমতি ইলা মিত্র, হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, মানিক সরকার, জ্যোতি বসু, ওয়াহিদা রেহমান, মিত্রবাহিনী ও ভারতীয় জনগণ প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

সাইমন ড্রিং

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

নেপালের ড. রাম. বরণ যাদব, বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা, গিরিজা প্রসাদ কৈরালা, চক্র প্রসাদ বাস্তোলা, শ্রী দামান নাথ ধুঙ্গানা, শ্রী অর্জুন নরসিংহ, ড. নারায়ণ খাদকা, শ্রী দিল বাহাদুর লামা ও ভুটানের জিগমে দরজি ওয়াংচুক ও শ্রী দশকর্মা দরজি। রাশিয়ার লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ, নিকোলাই ভিক্টোরভিচ পদগর্নি, অ্যালেকজাই নিকোলাভিচ কসিগিন, রিয়াল অ্যাডমিরাল সারগে, পাভলোভিচ জুয়েস্কো ও তার দল, এ্যানাটোলি ডব্রিনিন, নিকোলাই ফিরুবিন, আন্দ্রে আন্দ্রেভিচ গ্রোমিকো, কিরিলোউইচ কসচেউই, ইয়াকভ আলেকজান্দ্রোভিচ মালিক ও ভালদিমির স্ট্যানিস এবং 'প্রাভদা' সংবাদপত্র। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল জোসেফ টিটো, যুক্তরাজ্যের স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড জর্জ হিথ, মাইকেল বানর্স, সাইমন ড্রিং, জুলিয়ান ফ্রান্সিস, বিমান মল্লিক, ব্রুস ডগলাস মান, লর্ড পিটার ডেভিড শোর, অ্যান্থোনি লরেন্স ক্লিফটন, সাংবাদিক উইলিয়াম মার্ক টালি, ডোনাল্ড চেজওর্থ, ডেভিড মার্টিন স্কট স্টীল, লর্ড হ্যারল্ড উইলসন, ইলেন কনেট ও ড. পল কনেট। জার্মানির সুনীল দাশগুপ্ত ও বারবারা দাশগুপ্ত।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

যুক্তরাষ্ট্রের লিয়ার লেভিন, ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম, ডেভিড ওয়েসব্রড, ড. উইলিয়াম গ্রিনফ, আর্চার কে. ব্লাড ফ্রাঙ্কফরেস্টার চার্চ, এডওয়ার্ড সি. ডিমক জুনিয়র, শহিদ ফাদার উইলিয়াম পি ইভান্স, ফাদার ইউগেন হোমরিচ, জন কেনেথ গালব্রেইথ, কর্নেলিয়াস এডওয়ার্ড গালাঘের, জোসেফ গার্স্ট, উইলিয়াম বি. সাক্সবি, রিচার্ড কে টেইলর, মিস এ্যানা ব্রাউন টেইলর, জন এ ডাইন, থমাস এ ডাইন, ড. লিনকন সি. চেন, ড. মার্থা অল্টার চেন, মি. টাউন সেন্ড সুয়েজ, মি. ডান কগিন, অধ্যাপক স্টিফেন অ্যালান মার্কলিন, ড. ডেভিড নাইন, অ্যালান গিন্সবার্গ, গুস্তভ এফ পাপানেক, হান্না পাপানেক, ড. রিচার্ড এ ক্যাশ, ডানিয়েল সি. দুনহাম, ম্যারি ফ্রান্সিস দুনহাম ও ড. আলফ্রেড সমার। জাপানের সুয়োশি নারা, তাকায়োশি সুজুকি, তাকাশি হায়াকাওয়া, নাওয়াকি উসুই, তোমিও সিজোকামি, হেইজে নাকামুরা, কেন আরিমিসু ও লে. জেনারেল ইওয়াচি ফুজিওয়ারা। আয়ারল্যান্ডের ব্যারিস্টার নোরা শরীফ ও সেন ম্যাকব্রাইড। ডেনমার্কের ড. ক্রিস্টেন ওয়েস্টারগার্ড। ফ্রান্সের আন্দ্রে সালরক্স ও ড. প্রিথউইন্দ্রা মুখার্জি। সুইডেনের গুনার মিরডাল, লার্স লেইজন বর্গ, স্পেন স্ট্রোমবার্গ, জনাব সৈয়দ আসিফ সঙ্কর ও স্পেন লামপেল। ইতালির শহিদ ফাদার মিরডাল, লার্স লেইজন বর্গ, স্পেন স্ট্রোমবার্গ, জনাব সৈয়দ আসিফ সঙ্কর ও স্পেন লামপেল। ইতালির শহিদ ফাদার মারিও ভেরোনিচ ও ফাদার মারিনো রিগন।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

ভিয়েতনামের মে কুয়েন থি বিন। অস্ট্রেলিয়ার ড. জেফ্রে ডেভিস ও হারহার্ট ফেইথ। কিউবার ড. ফিদেল কাস্ট্রো রুজ। পাকিস্তানের বেগম নাসিম আখতার, জনাব জাফর মালিক, ড. ইকবাল আহমাদ, বেগম তাহিরা মাযহার আলী, জনাব মীর গাউস বক্স বিজেনজো, জনাব ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, জনাব হাবিব জালিব, জনাব মালিক গুলাম জিলানী, জনাব শামীম আসরাফ মালিক, জনাব ওয়ারিস মীর, জনাব কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, জনাব আনওয়ার পিরজাদো, জনাব আহমাদ

ঢাকায় বিদেশি নাগরিকদের সম্মাননা অনুষ্ঠান

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদানের স্বীকৃতি

সেলিম, ড. তারিক রহমান, মাস্টার খান গুল, খান আবদুল ওয়ালি খান ও খান আবদুল গাফফার খান। শ্রীলংকার স্যার সেনারাত গুনওয়ারদন ও ই. এ বিদ্যাশেখর। তুরস্কের সেটিন ওজাবায়রাক এবং মিশরের অধ্যাপক রিফাত মোহামেদ এল সাইদ ও আফ্রো-এশিয়ান পিপলস্ সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (AAPSO) |

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যেসব বিদেশি নাগরিক সমর্থন জানিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, স্বাধীনতার দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় পর ২০১২ সালের ২৭ মার্চ রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের সম্মান জানানো হয়। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৮৩ জনের হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

THANK YOU